



ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal

ISSN: 2454-1508

Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)

Volume- III, Issue-I, September, 2026, Page No. 69-76

Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711

Website: <https://www.atmadeep.in/>

DOI: 10.69655/atmadeep.vol.3.issue.01W.506



মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় প্রকৃতির ‘রুটম্যাপ’

পৃথ্বীশ মজুমদার, গবেষক, বাংলা বিভাগ, ভাষাভবন, বিশ্বভারতী, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত

Received: 20.09.2026; Accepted: 26.09.2026; Available online: 30.09.2026

©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

Abstract

Manindra Gupta was a distinguished poet of the 1960s. The elements of nature remained deeply intertwined with the lifelong oeuvre of this inherently autobiographical poet. The most profound aspect of his engagement with nature was his ability to evoke and construct poetry directly from the reservoirs of his memory. Beneath the surface-level natural motifs, it was Gupta's personal, introspective nature-consciousness that drove his creativity. His vision captured not only the pristine beauty of the natural world but also the poignant, existential angst of modern humans drifting away from it.

Occasionally, he sought unique, personal pathways to commune with nature. This distinct approach lends a rare uniqueness to his poetry. While he consciously avoided aligning his work with any overt political or social ideology, he drew rich insights from the biographies of various nature-lovers. Furthermore, Rabindranath Tagore served as his guiding light in many of these pursuits. Ultimately, he discovered a way to closely commune with nature through a detached, ascetic lifestyle. His verses passionately resonate with this alternative way of living, standing in stark, defiant contrast to the consumerist habits of twentieth-century society.

Keywords: Sixties, Autobiography, Poetic Seed, Affinity with Nature, Consumerism, Life of Renunciation, Roadmap

বিশ শতকের ছয় দশকে যারা বাংলা কবিতা চর্চায় ব্রতী হলেন তাঁদের অন্যতম মণীন্দ্র গুপ্ত। এই দশকের কবিতার স্বতন্ত্রতা মণীন্দ্র গুপ্তের নিজের ভাবনায় যেভাবে দর্শিত হয়েছিল, তাতে তিনি লক্ষ করেছিলেন–

“বলতে গেলে, মোটামুটি স্বাভাবিক, ঘরোয়া, মধ্যপন্থী মানুষদেরই সমবায় এই ‘ষাটে’র দশক।”^১

তবে এই সাধারণ হিসেবের বাইরেও ষাটের কবিদের রচনায় ‘তাত্ত্বিক, সাংকেতিক, বৈপ্লবিক, এবং প্রক্রিয়াশীল’^২ লেখকদের রচনাও এই দশকে বৈচিত্রময় কবিতায় পূর্ণ করেছে। তবে এর দশকের “উল্লেখযোগ্য প্রাণবন্ত ধারা”^৩ রূপে মণীন্দ্র গুপ্ত নির্দেশ করেছেন “আত্মজৈবনিক কবিতার ধারা”^৪টিকে। আত্মজীবনের অভিজ্ঞতায় তাঁদের কাব্যের “উৎস বীজ”^৫। এই ধারার কাব্যের বিষয়বস্তুতে জীবনের “প্ররোচনা”^৬, “উদ্বলতা”^৭ ও “পক্ষঘাত”^৮ ভাবসঞ্চারক হয়ে উঠেছে। এই ভাবসঞ্চারে প্রকৃতি কতখানি সহায়ক হয়ে উঠেছে আলোচ্য

সন্দর্ভের প্রতিপাদ্য সেটিই। আরেকটি বিষয় এখানে উল্লেখের দাবি রাখে, তা হল কাব্যের উৎস 'বীজ' একসময় অঙ্কুরিত হয়, ফলে সেই বৃদ্ধির দশাটি কেমন। মণীন্দ্রের কবিতা থেকে তার একটি প্রবাহমান রূপ পাওয়া যায়।

মণীন্দ্র গুপ্তের জন্ম বরিশালে গৈলা গ্রাম। যে গ্রামের অপর দুই বিখ্যাত কবি বিজয় গুপ্ত এবং জীবনানন্দ দাশ। এই গ্রামের পরিবেশ ও প্রকৃতিই মণীন্দ্র গুপ্তের চেতনালোকে প্রকৃতির ভূমিকাকে জাগ্রত করে তুলেছিল। 'নীল পাথরের আকাশ' কাব্যের 'একখণ্ড জমি, একটি দুপুর ও আমার শৈশব, শীর্ষক কবিতায় তিনি উচ্চারণ করেন— "ঐ বাঁশঝাড়তলে, ওই তারবন নিয়ে কোলে, আমার শৈশব/ বন্দী হয়ে শুয়ে থাকে, খেলে ঘোরে।"^{১০}

—এই শৈশবের যাপিত কালটি মণীন্দ্রের ব্যক্তিগত যাপন। তাঁর আত্মজীবনী 'অক্ষয়মালবেরি'র পাতায় রয়েছে তাঁর ছেলেবেলার কথা। মাত্র দশমাস বয়সে মাতৃহারা কবির লালন-পালনের ভার এসে বর্তে ছিল তাঁর ঠাকুরদা-ঠাকুমার কাছে। শৈশবের সেই কালে মাতৃহীন মণীন্দ্রের আশ্রয় হয়ে উঠেছিল প্রকৃতি। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবনস্মৃতি'র পাতায় উল্লেখ আছে অনাদৃত-অবহেলিত শৈশবের কথা। ঠাকুরবাড়ির ভৃত্য পরিবেষ্টিত জীবনে গুরুদেব সেই অনাদরের মধ্যে স্বাধীনতার স্বাদ খুঁজে পেয়েছিলেন। 'জীবনস্মৃতি'র পাঠকমাত্রই জ্ঞাত আছেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর শৈশবের বন্ধঘরে জানালা দিয়ে বিশ্বপ্রকৃতির সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। গৈলা গ্রামে প্রকৃতির উন্মুক্ত মণীন্দ্র গুপ্তের প্রকৃতির সঙ্গে মেলামেশায় ছিল না কোনো আড়াল-আবডাল। তবে এক্ষেত্রে তাঁর জীবনে প্রকৃতির সঙ্গে একাত্ম হবার আরও একটি কারণ ছিল বিদ্যমান- অনাকাজিত মাতৃ-মৃত্যু তাঁকে ঠেলে দিয়েছিল প্রকৃতির দিকে একথা বললে অভ্যুক্তি হবে না। মায়ের মৃত্যুর ঘটনাটি তাঁর যুক্তিবাদী দৃষ্টিতে "একটা প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র"^{১১} বলে মনে হলেও গ্রামীণ পরম্পরাতে পড়শী কুটুম্ব স্ত্রীলোকদের কাছে তিনি অভিহিত হয়েছিলেন 'পোড়াকপালিয়া' আখ্যায়। একইসঙ্গে এই অভিধা ও মায়ের মৃত্যুহেতু অযাচিত করুণা বাক্যের প্রভাবে ধীরে ধীরে তিনি নিজেও অপরাধবোধ অনুভব করতে থাকেন—

“মনে হত, কোনো দুর্গম কারণে সংসারে আমি অস্বাভাবিক, এবং একা।/ এই নকল দুঃখই বোধ হয় আত্মকরুণা, দুষ্টমি করে মারধর খেলে আমি ঐ দুঃখকে খুঁজতে বেরুতাম। মুখখানা স্নান করে একা একা ঘুরতাম খালপাড়ে অথবা উঁচু টিবির উপর বিশাল শিরীষ গাছের তলায় যেখানে কেউ যায় না। সেখান থেকে দেখতাম, দিগন্ত মেঘের মধ্যে কি যেন ঘনিয়ে উঠছে। আমি মুখ নিচু করে দুঃখকে খুঁজতাম, মাটিতে কোথায় সে গাঁথে আছে ভাঙা সবুজ বোতলের টুকরো হয়ে।”^{১২}

— শুধু কী তাই, এই প্রকৃতি কীভাবে তাঁর জীবনের সঙ্গে মিশে গেল তার একটা বর্ণনা আছে। যে বাড়িতে মণীন্দ্রের শৈশবের আটটি বছর অতিক্রান্ত হয়েছে সেই বাস্তু বাড়ির চারিদিকেই ছিল সবুজের আয়োজন—

“এই ঘরের পূর্ব দিকের জানালায় শিউলি গাছ, ডালিম গাছ, আর পশ্চিমের দরজা দিয়ে নামলেই বাঁ দিকে বেলফুলের সারি, শশার মাচা, বাতাবি লেবুর গাছ। সামনের দিকে জামিরের গাছ ঝোপ হয়ে আছে, করমচা গাছে রতেন মতো পাকা করমচা। তার পিছনে আরো গাছ, জিয়লের বেড়া, কলমি লতায় ভরা পশ্চিম পুকুর।”^{১৩}

এহেন বাস্তু বাড়ির উন্মুক্ত উঠোনের সামনে হাঁটতে শেখার পর একদিন গাছের কাছে, বনের কাছে তাঁর আশ্রয় হল। মনখারাপের বেলায় এ বন যেমন তাঁর আস্তানা ছিল তেমনই গৈলার বনে, মাঠে, বাগানে, ভিটের চতুর্দিকে শিশুদের “চিরদিনের নিজস্ব ভাণ্ডার”^{১৪} ছিল। সেখান থেকে সহজেই মিলত বেতফল, কাঁটাবোহরের ফল, গাব ফল ইত্যাদি। স্বাভাবিকভাবেই বোঝা যায় প্রকৃতির সংলগ্নতা মণীন্দ্রের শৈশব ঘিরে যে অভিজ্ঞতার জগৎ তৈরি করে দিয়েছিল, পরবর্তীসময়ে তাঁর সাহিত্যের মধ্যে সেই জগতের এক ছায়া পড়েছিল- যা আসলে অভিজ্ঞতাজাত কাব্য 'বীজ'। এক্ষেত্রে উল্লেখ প্রয়োজন মণীন্দ্রের ঠাকুরদাদারও ছিল এই অরণ্যের প্রতি স্বাভাবিক টান। দৈনন্দিন

জীবনের নানান প্রয়োজনীয় সংগ্রহ তিনি বনে-বাঁদাড়ে ঘুরে সংগ্রহ করে আনতেন। এই কাজে তাঁর সহায়ক ছিলেন শিশু মণীন্দ্র। ফলে ঠাকুরদাদার সঙ্গ মণীন্দ্রের প্রকৃতিপাঠের ভূমিকা রচনা করেছিল।

মণীন্দ্র গুপ্তের শৈশবের এই প্রেক্ষাপট থেকেই বোঝা যায় তাঁর জীবনে প্রকৃতি সংলগ্ন জীবনের প্রতি টানের উৎসটি। গ্রাম ছেড়ে শহরে এলেও চেষ্টা করতেন তিনি শৈশবের প্রকৃতিকে বয়ে নিয়ে গিয়েছেন আজীবন। কিন্তু কত মানুষই তো গ্রাম থেকে শহরে আসে, মণীন্দ্রের গ্রাম গৈলা থেকেও কাজের সূত্রে মানুষ কলকাতা শহরে আসত। কিন্তু কবির যে চোখ গড়ে ওঠে, সাধারণের সেই চোখ গড়ে না। তাই জন্মলগ্নে যে 'সবুজ বীষ' ছড়িয়ে গিয়েছিল তাঁর শরীর জুড়ে সেই সবুজের জয়গান তাঁর কবিতার ভাববস্তু হিসেবে, তাঁর আত্মকথার অংশ হিসেবে লেখার জগতে স্থান করে নিল। বিশেষ করে তাঁর কবিতার মধ্যে এই জগতের ছায়া নির্মিত হতে দেখা যায়। সেইসূত্রটিকে ধরিয়ে দিতেই তিনি লেখেন— “আস্তে আস্তে টের পাই নি তো— কখন হলদে তালি জামা গায়ে রোদ/ চুপি চুপি রাঙা মুখে বাঁশবনের মগডালে চড়ে,/ ঘরে ফেরা কাকের গলায় শুনি হঠাৎ সন্ধ্যার কলরব।”^{১৩} চল্লিশোর্ধ বয়সে তিনি আসন্ন বার্ধক্যের কলরব শুনবেন সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সেই ডাকে মিশে গেছে তাঁর শৈশবের সবুজ জীবন। ‘নিশ্চিহ্ন-দেশের প্রান্তে’ কবিতার সবুজে ঘেরা দেশের স্মৃতি কবিচিন্তে জাগ্রত হয়েছে—

“প্রলয়পয়োধিজলে/ স্মৃতি ভেসে যায়— / উদাসীন বটপত্রে/ একা/ ক্রমাশয়ে— দূরে—
দূরে— দূরে— / শুধু বিস্মৃতির দীর্ঘরেখ বালুতীরে / শুয়ে থাকে নির্জন করোটি।/ কী আশ্চর্য!
কিছু দিন একসঙ্গে ছিল ওরা দুটি:/ নিশ্চিহ্ন- দেশের প্রান্তে/ কি করে যে হয়েছিল / দেখা!”^{১৪}

—মণীন্দ্রের এই লেখায় স্মৃতির ভাসমান রূপটি কবিতার শৈল্পিক বিন্যাসে উঠে এসেছে। তারচেয়েও আকর্ষণের জায়গা স্মৃতির স্বস্থানের সঙ্গে পৌঁছ মণীন্দ্রের সাক্ষাৎলাভের বিষয়। প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় স্বস্থানের ধারণা প্রসঙ্গে তাঁর ‘ভাষাত্তদর্শন’ বইতে লিখেছেন—

“বস্তুত, স্বস্থান কী? আমার তো মনে হয়, যেখানে সত্তার কোনো বিচ্ছিন্নতাবোধ হয় না তা-ই তার স্বস্থান। যেখানে তার নিজস্বতাটিকে তাকে বানাতে হয় না, তা-ই তার স্বস্থান।”^{১৫}

—মণীন্দ্র গুপ্তের জগৎ এই প্রকৃতিকে ঘিরে। তাই তাঁর স্বস্থানের ধারণাতে মিশে গিয়েছে এক নিসর্গচেতনা। যেখানে তিনি ফিরিতে চেয়েছেন বারবার। কল্পনা দিয়ে গড়তে চেয়েছেন সেই পীঠকে। কবিতা সংগ্রহের এই কবিতার ঠিক পরবর্তী কবিতা ‘অপ্রত্যাশিত পেয়’। সেখানে এই স্বস্থানে মাঝে মাঝে ফিরে যাবার কথা রয়েছে। সেখানে বর্ণিত পুকুরের কাছে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবেই ‘গাছের আড়ালে’ ‘বুকভরা জল – স্নেহ’ পেয়ে যান।

প্রকৃতির প্রতি এই মুগ্ধবোধ মণীন্দ্রের কবিতার অন্যতম আকর্ষণের জায়গা। কবির স্মৃতির স্মরণি বেয়ে অতীতে প্রকৃতিঘেরা অতিপ্রাকৃত জগতে ফেরার বিষয়টি রোমান্টিক কবির নিসর্গ মুগ্ধতার সঙ্গে তুলনীয় হলেও তা বিশিষ্ট হয়ে উঠেছে কবির দৃষ্টিভঙ্গির কারণে। কবি মণীন্দ্রের রোমান্টিকতার বিষয়টি অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিহত হয়েছে বর্তমানের বাস্তবতার সম্মুখীন হয়ে। ‘দম্পতি’ কবিতায় পৃথিবীকে প্রান্তিক বাড়ি বলে চিহ্নিত করেছেন, বিপরীতে নরনারীদ্বয়ের ‘টেলিফোন, ফ্রিজ, গাড়ি, স্পর্শসুখী আসবাবে’ ঘেরা বাড়িটিকে সাজানো বাড়ী বলেছেন। এই এই আশ্চর্য সাজানো বাড়ির সৌন্দর্য খান খান হয়ে ভেঙে পড়েছে যখন কবি বলেন— “শান্তির মতন এক স্নান ছায়া/ নিষ্ঠার মতন এক পুত্তলি অনীহা/ সুখের মতন এক নিষ্ফল আবহাওয়া/ সারা বাড়ি আর সেই দৈব নরনারীদ্বয়ে/ অদ্ভুত দূরত্বে ঘিরে রাখে।”^{১৬} —শান্তি, নিষ্ঠা, সুখ কোনোটিই শেষপর্যন্ত এই বাড়ির মধ্যে আকাজ্জিত মায়ার জন্ম দিতে পারেনি। ‘বাড়ি’ কবিতায় না পাওয়া এই জগতের নির্মাণের স্বপ্ন দেখেছেন তিনি। আনন্দময় বাড়ির প্রতিটি খুঁটিনাটি নিজে হাতে তদারক করতে চাওয়ার মধ্যে পূর্বোক্ত প্রকৃতি-তন্ময়তাই দৃশ্যমান। কবি বলেন, তিনি প্রত্যেকের জন্য ‘আলাদা আলাদা প্ল্যান করে’ দেবেন; বলেন ‘ফার্মিচারও আমি ডিজাইন করে দেব,

আপহেলস্টোরি পছন্দ করে/ দেব'। শুধু তাই নয়, এই বাড়িতে দিনশেষের দৃশ্যটি অত্যন্ত আকর্ষণীয় – মৃদু আলোয় দেখা যাবে সেই বাড়ির চারপাশে 'জলকুসুমেরা দুলছে'। এই দৃশ্য মণীন্দ্র গুপ্তের পরিচিত শৈশবের চেনা ছবি। বাড়ির চতুর্দিকের জলাশয়ে কুসুমের দোদুল্যমান অবস্থা তিনি যেন চোখ বুজলেই দেখতে পান। মণীন্দ্র গুপ্তের মতনই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতাতে এই ভাবনার প্রসারণ লক্ষ করা যায়। 'আমি দেখি' কবিতায় শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলেন— "গাছগুলো তুলে আনো, বাগানে বসাও/ আমাদের দরকার শুধু গাছ দেখা/ গাছ দেখে যাওয়া/ গাছের সবুজ টুকু শরীরে দরকার/ আরোগ্যের জন্যে ওই সবুজের ভীষণ দরকার"^{১৭}—শক্তি চট্টোপাধ্যায় ও মণীন্দ্র গুপ্তের এই কামনা ব্যক্তিগত চেতনার স্তরটিকে ছুঁয়ে পাঠককে পৌঁছে দেন কাব্যের কল্পলোকে।

'কবিতার জীবন ও দুঃপ্রবেশ্যতা' প্রবন্ধে মণীন্দ্র গুপ্ত কবিতার প্রজনন প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে জানান 'প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা' একসময় স্মৃতি হয়ে 'বর্ণচোরা অলৌকিকত্ব পায়'। তা যেমন সাহিত্য নির্মিতর বীজ, তেমনি তা লেখকের অন্তর্জগতেরও নির্মাণে সহায়তা করে। 'সমকালের মানুষ' ও আধুনিক জীবনের সমস্যা নিরসনে তিনি প্রকৃতিলগ্ন জীবনের কথা আলোচনা করেছেন। ষাটের দশকে লিখতে আসার পর তিনি যে পৃথিবীকে দেখলেন সেখানে নানান মতবাদ, সমস্যা সংকটের চিত্র স্বাভাবিকভাবেই তাঁর দৃষ্টিতে ধরা পড়েছিল। কিন্তু মণীন্দ্র তাঁর স্বভাবসিদ্ধ রচনা কৌশলে কোথাও এই পক্ষে বা বিপক্ষে না গিয়ে তুলে ধরতে চেয়েছেন সমস্যা মোচনের এক আশ্চর্য পথ। 'আফ্রিকা' কবিতায় ঔপনিবেশিক শাসনের কুটল কুচক্রীদের হাতে এই পৃথিবীর সবুজ শান্তির ধ্বংস যজ্ঞের বর্ণনায় শক্তি কবিচিত্ত অশনিসংকেত ব্যক্ত করেছেন। রবীন্দ্রনাথের সেই অশনিসংকেত পরবর্তী সময়েও নাটকে ফিরে এসেছে। 'মুক্তধারা' কিংবা 'রক্তকরবী'তে যার প্রকাশ। 'পল্লীপ্রকৃতি'তে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্ধৃত করেন—

“এ সমস্যা আজ শুধু এখানে নয়, মানুষের সর্বগ্রাসী লোভের হাত থেকে অরণ্যসম্পদকে রক্ষা সর্বত্রই সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমেরিকাতে বড়ো বড়ো ধ্বংস করা হয়েছে, তার ফলে এখন বালু উড়িয়ে আসছে ঝড়, কৃষিক্ষেত্রে কষ্ট করছে, চাপ দিচ্ছে ... লুপ্ত মানুষরণ্যকে ধ্বংস করে নিজের ক্ষতি ডেকে এনেছে; বায়ুকে নির্মল করবার ভার যে গাছপালার উপর যার পত্র ঝরে গিয়ে ভূমিকে উর্বরতা দেয়, তাকেই সে নির্মূল করছে... আজ অনুতাপ করবার সময় হয়েছে।”^{১৮}

– অনুতাপের বদলে এই পৃথিবীকে তার হারানো সত্তা ফিরিয়ে দেবার লক্ষ্যে তিনি চালু করেছিলেন 'হলকর্ষণ' অনুষ্ঠান। আনুষ্ঠানিকতার মোড়কে প্রকৃতির মঙ্গলকামনাই ছিল উদ্দেশ্য। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর লক্ষ করেছিলেন মানুষের ত্রুরতার এবং প্রকৃতিকে নির্মূল করার পেছনে রয়েছে তার লোভ নামক রিপু—

“পৃথিবীর দান গ্রহণ করবার সময় লোভ বেড়ে উঠল মানুষের। আজকার অনুষ্ঠান পৃথিবীর সঙ্গে হিসাব-নিকাশের উপলক্ষে নয়। মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার, পৃথিবীর অঙ্গসঙ্গে একত্র হবার যে বিদ্যা, মানবসভ্যতার মূলমন্ত্র যার মধ্যে, সেই কৃষিবিদ্যার প্রথম উদ্ভাবনের আনন্দস্মৃতিরূপে গ্রহণ করব এই অনুষ্ঠানকে।”^{১৯}

'হলকর্ষণ' উৎসবের মধ্যে দিয়ে শুধু প্রকৃতির দানের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি নয় তদূর্ধ্বে 'মানুষের সঙ্গে মানুষের মেলবার' বিষয়টিও জড়িত। 'চিরমিছিল' কবিতায় মণীন্দ্র গুপ্তও উল্লেখ করেছেন — “আজকাল যে যার মতন যায়, কেউ কাউকে এগিয়ে দেয় না।” – মানুষের শেষযাত্রার মুহূর্তেও এযুগের মানুষ বড় একা; যার কারণ প্রকৃতির সান্নিধ্য-বর্জন। কবিতায় শেষযাত্রার সময় 'শূন্য জুড়ে' থাকা 'লাল মেঘ', 'বাঁশের দোলা' এই অনুষঙ্গ দুটিই বুঝিয়ে দেয় চিরবিদায়ের পথে একসময় মানুষের বাহক হিসেবেও ছিল প্রকৃতির ব্যবহার এবং প্রিয়জনের

চলে যাবার শূন্যতা ক্রমশ প্রকৃতিকেও স্পর্শ করত। প্রকৃতি কীভাবে মানুষকে ঘিরে রাখত তার আরেকটি নমুনা রয়েছে 'বাচ্চাদের কবিতা'য়—

“জন্ম থেকে দেখে আসছি, আমাদের ডান পাশের বাড়িটা বাঁদরদের,/ বাঁ পাশের বাড়িটা বেড়ালদের।/ মধ্যখানে আমরা কাকাতুয়া বদ্রিকা আর মনিয়া পুষি বলে/ আমাদের বাড়ির নাম হয়েছে পাখিদের বাড়ি।”^{২০}

—মানুষ শুধু একক জীব নয় তার অস্তিত্বের সঙ্গে অন্যান্য জীবের সম্পর্ক অত্যন্ত স্বাভাবিক। এই স্বাভাবিক জীবনই মণীন্দ্রের কাছে প্রত্যাশিত। ভোগবাদের সমাধানকল্পে এমন যৌথজীবনই কাম্য বলে মনে করেছেন তিনিই।

মণীন্দ্র গুপ্ত সমাজ সংস্কারক নন, তিনি কোনো পরিবেশকর্মীও নন। তবে আধুনিক জীবনের যে জটিল রূপটিকে তিনি পর্যবেক্ষণ করেছিলেন সেখানে তিনি লক্ষ করেছিলেন আধুনিক মানুষের 'কনজিউমার' চরিত্রটি। গ্রাম জীবনের বিপরীতে ছিল এই 'কনজিউম' সর্বস্ব আধুনিক জীবন। গ্রামে থাকাকালীন মণীন্দ্রের শৈশবে শিশুদের নিজস্ব 'চিরদিনের নিজস্ব ভাণ্ডার' থেকে যেমন আহরণ করত উদরপূর্তির উপকরণ, তেমনি বড়রাও সংসারের দৈনন্দিন খাদ্যের একটা বড় অংশ বাড়িতেই পেয়ে যেতেন। 'অক্ষয় মালবেরি'র 'আমাদের ভাড়ার' অংশ থেকে বোঝা যায় এই বিষয়টি

“আমাদের গ্রামের জীবনে, চার বেলা খাবার নানান উপকরণ সংগ্রহ, রান্না করা এবং শিশুদের অনন্ত খাওয়া— এই তিনেতেই ভরে থাকত আমাদের দিনক্রিয়া, আমাদের আনন্দ, আমাদের দুঃখও। সকালবেলা দাদু কোনোদিন কাঁটায় ভরা বেত লতার জঙ্গল থেকে সবুজ একগোছা বেতের ডগা কেটে এনে নামিয়ে দিলেন রান্নাঘরে। বড়মা স্নান করতে গিয়ে ডুব দিয়ে দিয়ে তুললেন ফুলসুন্ধ সজল শাপলা। ছোটমা আঁকশি দিয়ে পশ্চিমপুকুর থেকে টেনে টেনে নিয়ে এল কলমি আর হিঞ্গে। গিমে শাক, থানকুনি আর বিলেতি ধনেপাতা তো রান্নাঘরের ছাঁচতলায় হয়েই আছে, আমিই খুঁটে খুঁটে তুলে আনতে পারি। এসব হল হাতের কাছে পাওয়া প্রথমভোরের জিনিস।”^{২১}

— কোনো বিনিময়মূল্য ছাড়াই প্রাত্যহিক জীবনের খাদ্যের উপাচার সংগ্রহের এই ধরণটি আধুনিক সময়ে এসে ভাঙতে থাকে। সমস্ত বিষয়কে পণ্য হিসেবে তুলে ধরা এবং সর্বোচ্চ মুনাফা লাভের জন্য প্রকৃতির স্বাভাবিকত্ব ধ্বংসের বিষয়টি তাঁর দৃষ্টি এড়ায়নি। তবে এক্ষেত্রে তিনি মার্কস ও হেগেলের বস্তুবাদী দর্শনের অনুসারী নন। এই সন্দর্ভের শুরুতেই মণীন্দ্রের আত্মবিবৃতির মধ্যে উল্লেখ রয়েছে দার্শনিক হিসেবে তিনি সমাজবাদী, বস্তুবাদী কোনোটাই নন; বরং তিনি একটি মধ্যপন্থা অবলম্বন করে চলেছেন। সেখানে বুদ্ধ, রামকৃষ্ণ, গান্ধীর কথা যেমন উচ্চারিত হয়েছে তেমনি ধ্বনিত হয়েছে মহাভারতের অনুষ্ঙ্গ; আবার আধুনিক সময়ের লেখক বাশোর জীবন দর্শন তাঁকে যেমন প্রভাবিত করেছে, রবীন্দ্রনাথও ঠিক ততখানিই গভীর ছাপ ফেলেছে। নিকিঞ্চন জীবনকে তিনি বেঁছে নিয়েছেন পণ্য সর্বস্ব জীবনের বিকল্প হিসেবে।

কবিতায় আরেকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করেছেন মণীন্দ্র গুপ্ত। মানুষকে পৃথিবীর অন্যান্য প্রাণীদের সঙ্গে একাসনে বসিয়ে আশ্চর্য বোঝাপড়া করতে চেয়েছেন তিনি। এই পৃথিবীর লিখিত ইতিহাস শুধুমাত্র মানুষের। মানুষ ব্যতীত সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণীদের অক্ষমতা তাদের কোনো ইতিহাস গড়তে দেয় নি। তাতে যদিও অনন্ত সময়ের কাছে তাদের অস্তিত্ব নাকচ হয়ে যায় না। পার্থিব সভ্যতার চিরকালীন প্রবাহের একটি বৃহত্তর অংশ হিসেবেই তারা রয়ে যায়। 'ঈশ্বর' কবিতায় তিনি বলেন “মনে করো:/ প্রলয়ের পরে নতুন পৃথিবী জাগছে—

অন্ধ শূন্যে মেঘের মতন সাদা মাটি।' / 'সূর্য, হাওয়া, জলাশয়,/ গাছ অবশ্যই ...' / 'আর তুমি?' / 'হ্যাঁ হ্যাঁ— স্বতসিদ্ধ আমি তো আছিই।' /

'আর কিছু—? মেঘে রঙ, জলে মাছ, শূন্যে পাখি, ঋতু, স্বপ্ন, / স্মৃতি, ভবিষ্যৎ? —এসব চাও না?'—মণীন্দ্রের প্রকৃতিচেতনার এক আশ্চর্য সমীকরণ কবিতাটিতে দেখা যায়। সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরের সঙ্গে কাল্পনিক এই সংলাপে এই নতুন পৃথিবীর জন্য মণীন্দ্র গুপ্ত কী কী বেঁছে নিতে চান তা জানতে চেয়েছেন ঈশ্বর। ঈশ্বর তার তিনটি মনোবাঞ্ছা পূরণের জন্য অবতীর্ণ হয়েছেন এখানে। প্রথম আশীর্বাদে কবি নতুন পৃথিবীর জন্য চেয়েছেন জল, হাওয়া, সূর্য, গাছ। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে দিতে চেয়েছেন রঙিন মেঘ, মাছভর্তি জলাশয়, পাখি, ঋতু, স্বপ্ন, স্মৃতি, ভবিষ্যৎ ইত্যাদি। এপর্যন্ত সহমত পোষণ করলেও ঈশ্বরের তিন নম্বর দান গ্রহণের পূর্বে চিন্তিত হয়েছেন। কারণ এরসঙ্গে ঈশ্বর তাকে তিন নম্বর আশীর্বাদ হিসেবে দিতে চেয়েছেন গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব, জানোয়ারে টানা গাড়ি, মদ, মধু, অসংখ্য মৈথুন, কার্তুজ আগুন এবং পরাজয়। প্রথম ও দ্বিতীয় চাওয়াতে কবির ক্ষেত্রে কোনও দ্বিধা কাজ করেনি, কিন্তু তৃতীয়টির ক্ষেত্রে কবি চিন্তিত। এবং এক্ষেত্রে ঈশ্বর যা যা দিতে চেয়েছেন তার প্রতি কবির অনীহা ও আতঙ্ক লক্ষণীয়। শুধু তাই নয় তা ক্ষেত্রে পরিত্রাণের জন্য তিনি শ্মশানে যেতে চেয়েছেন। এই প্রকৃতির সামান্য যেটুকু দেখেছেন তিনি, তাতেই তিনি বিস্মিত হয়েছেন। অরণ্যের আদিম সত্তার পাশে তৃতীয় আশীর্বাদটি ভূতের মতই ভয়ের কারণ। স্বাভাবিকভাবেই কবি এই তিন নম্বর বিষয়গুলি থেকে পালাতে চেয়েছেন। আসলে তিনি রসিকতার ছলে 'আমি ডোমকানা বাঁশবনে' বললেও এখানে স্পষ্ট একটি নির্বাচন লক্ষ করা যায়। ভোগবাদ মণীন্দ্রের না-পসন্দ, সেইসঙ্গে স্বাভাবিক জীবন বলতে চেয়েছেন এমন এক প্রকৃতি ঘেরা জীবন যেখানে মানবীয় সত্তার সঙ্গে একই যোগসূত্রে গ্রথিত আছে সৃষ্টির অন্যান্য প্রাণসত্তা। 'একটু বাড়ির জন্য কবিতায়' তিনি যেন ঈশ্বরের তিন নম্বর আশীর্বাদের ভয়ঙ্কর দিক নির্দেশ করেছেন— "এ বছর ওকে বড় মনে পড়ছে—ত্রুর শহরের এই নিষ্ঠুর রংবাজি/ বিষের ছোবল মারছে অহরহ—একটু লুকোবার বাড়ি চাই।/ তালগাছপ্রমাণ হর্ম্য যক্ষরক্ষদের—আমরা ঢুকতে পাই না—/ খুব শক্ত বাড়ি।"^{২২}—কবির ইঙ্গিতে উঠে এসেছে নাগরিক জীবনের ক্রেদতা। ইটকাঠের উঁচি ইমারতে ঘেরা নাগরিক জীবনের মধ্যে রয়েছে ত্রুরতা। 'যক্ষরক্ষ' শব্দটির সূত্রেই রক্তকরবীর প্রসঙ্গ উঠে আসে। 'যক্ষপুরী'র বাঁধন কেটে বের হতে চেয়েছিল সেখানকার শ্রমিকেরা। তাদের মধ্যে নন্দিনীকে রঞ্জন খোলা প্রান্তরের আশ্রয় দিতে চেয়েছিল। যক্ষপুরীর তাল তাল সোনার বদলে পৌষের পাকা ফসলের হাতছানি রবীন্দ্রচিন্তে গ্রহণীয় হয়ে উঠেছিল। 'হলকর্ষণ' প্রবন্ধে এই গ্রহণযোগ্যতার কারণটির স্পষ্ট উল্লেখ আছে—

“কৃষিযুগের পরে সম্প্রতি এসেছে সদর্পে যন্ত্রবিদ্যা। তার লৌহবাহু কখনো মানুষকে প্রচণ্ডবেগে মারছে অগণিত সংখ্যায়, কখনো তার প্রাপ্তগণে পণ্যদ্রব্য দিচ্ছে ঢেলে প্রভূত পরিমাণে। মানুষের অসংযত লোভ কোথাও আপন সীমা খুঁজে পাচ্ছে না। একদিন মানুষের জীবিকা যখন ছিল সংকীর্ণ সীমায় পরিমিত, তখন মানুষ ছিল পরস্পরের নিষ্ঠুর প্রতিযোগী। তখন তারা সর্বদাই মারের অস্ত্র নিয়ে ছিল উদ্যত। সে মার আজ আরো দারুণ হয়ে উঠল। আজ তার ধনের উৎপাদন যতই হচ্ছে অপরিমিত তার লোভ ততই তাকে ছাড়িয়ে চলেছে, অস্ত্রশস্ত্রে সমাজ হয়ে উঠছে কণ্টকিত। যন্ত্রযুগের বহুপূর্ববর্তী সেই দিনের কথা আজ আমরা স্মরণ করব যখন পৃথিবী স্বহস্তে সন্তানকে পরিমিত অল্প পরিবেশন করেছেন, যা তার স্বাস্থ্যের পক্ষে, তার তৃপ্তির পক্ষে যথেষ্ট— যা এত বীভৎস রকমে উদ্ভূত ছিল না, যার স্তূপের উপরে কুশী লোলুপতায় মানুষ নির্লজ্জভাবে নির্দয় আত্মবিস্মৃত হয়ে লুটোপুটি হানাহানি করতে পারে।”^{২৩}

— রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের এই চিন্তার পাশে 'ঈশ্বর' কবিতায় বর্ণিত কবির ভয়ের উৎসটিকে পাশাপাশি রেখে পাঠ করলেই বোঝা যায় মণীন্দ্র গুপ্তের ক্ষেত্রেও প্রকৃতি ও সভ্যতার দ্বন্দ্বময়তা চেতনার দিক থেকে কবিগুরুর প্রায় অনুরূপ। তবে মণীন্দ্র গুপ্তের ব্যক্তিচেতনায় ছিল শৈশবের স্মৃতি। এই সক্রিয় স্মৃতি পথ ধরে তিনি প্রকৃতির সেই রূপটির কাছে ফিরে যেতে চান, কার্যত পূর্বোন্নিখিত 'একখণ্ড জমি, একটি দুপুর ও আমার শৈশব' কবিতার পঙক্তি দুটিকে আরও একবার স্মরণ করা যেতে পারে— “ওই বাঁশঝাড়তলে, ওই তারাবন নিয়ে কোলে, আমার শৈশব/ বন্দী হয়ে শুয়ে থাকে, খেলে, ঘোরে।” —এই বাঁশবন ঘেরা গৈলার প্রকৃতিময় পরিবেশে ফিরে যাবার রুটম্যাপই কবিতায় তিনি এঁকেছেন। ভোগবাদের কারণেই হোক কিংবা ব্যক্তিগত পরিস্থিতির জন্যই হোক, যেখানেই তিনি বিপন্ন বোধ করেছেন সেখানেই তিনি স্মৃতির রুটম্যাপ বেয়ে পৌঁছে গিয়েছেন শৈশবের একখণ্ড ভূমির কাছে। প্রকৃতিচেতনা তাই নিছক তত্ত্বের ভারে ক্লান্ত হয়ে উঠেনি তাঁর কবিতায়। তার বদলে কবিতায় ফেলে আসা প্রকৃতি জীবনের সঙ্গে উদার ভোগসর্বস্ব জীবনের তুলনার বিষয় হয়ে উঠেছে; এবং কবির সাপেক্ষে সেই তুলনাতে তিনি সবসময় প্রকৃতির আদিম রূপের পক্ষে সওয়াল করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ সম্পা। 'ষাট দশকের কবিতা'। আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৮৫।
২. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ সম্পা। 'ষাট দশকের কবিতা'। আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৯৬।
৩. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ সম্পা। 'ষাট দশকের কবিতা'। আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৯৬।
৪. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ সম্পা। 'ষাট দশকের কবিতা'। আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৯৬।
৫. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ সম্পা। 'ষাট দশকের কবিতা'। আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৯৬।
৬. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ সম্পা। 'ষাট দশকের কবিতা'। আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৯৬।
৭. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, এবং বন্দ্যোপাধ্যায়, দেবীপ্রসাদ সম্পা। 'ষাট দশকের কবিতা'। আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৯৬।
৮. দাশগুপ্ত, অলোকরঞ্জন, এবং দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়, সম্পা। 'ষাট দশকের কবিতা'। আধুনিক কবিতার ইতিহাস, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ২০১১, পৃ. ১৯৬।
৯. গুপ্ত, মণীন্দ্র। 'নীল পাথরের আকাশ'। কবিতা সংগ্রহ, আদম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ২০১৬। পৃ. ২৫।
১০. গুপ্ত, মণীন্দ্র। অক্ষয় মালবেরি। অবভাস, কলকাতা, ২০১৮ পৃ. ১২।
১১. গুপ্ত, মণীন্দ্র। অক্ষয় মালবেরি। অবভাস, কলকাতা, ২০১৮ পৃ. ২১।
১২. গুপ্ত, মণীন্দ্র। অক্ষয় মালবেরি। অবভাস, কলকাতা, ২০১৮ পৃ. ২২।
১৩. গুপ্ত, মণীন্দ্র। 'নীল পাথরের আকাশ'। কবিতা সংগ্রহ, আদম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ২০১৬। পৃ. ২৫।
১৪. গুপ্ত, মণীন্দ্র। 'নীল পাথরের আকাশ'। কবিতা সংগ্রহ, আদম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ২০১৬। পৃ. ২৫।
১৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রসূন। ভাষাত্তদর্শন, ধ্যানবিন্দু, কলকাতা, ২০১৪ পৃ. ১৫।

১৬. গুপ্ত, মণীন্দ্র। 'আমার রাত্রি'। কবিতা সংগ্রহ, আদম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ২০১৬। পৃ. ৩৭।
১৭. চট্টোপাধ্যায়, শক্তি। 'আমি দেখি'। অঙ্গুরী তোর হিরণ্য জল, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, শ্রাবণ, ১৩৮৭ বঙ্গাব্দ।
১৮. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'পল্লীপ্রকৃতি'। পল্লীপ্রকৃতি, বিশ্বভারতী, ১৯৬২।
১৯. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'হলকর্ষণ'। পল্লীপ্রকৃতি, বিশ্বভারতী, ১৯৬২ পৃ. ১০৭।
২০. গুপ্ত, মণীন্দ্র। 'বাচ্চাদের কবিতা'। টুং টাং শব্দ নিঃশব্দ, কবিতা সংগ্রহ, আদম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ২০১৬, পৃ. ২৪৪।
২০. গুপ্ত, মণীন্দ্র। অক্ষয় মালবেরি, অবভাস, কলকাতা, ২০১৮।
২১. গুপ্ত, মণীন্দ্র। 'ঈশ্বর', 'লাল স্কুলবাড়ি'। কবিতা সংগ্রহ, আদম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ২০১৬। পৃ. ৮৭।
২২. গুপ্ত, মণীন্দ্র। 'একটু বাড়ির জন্য', 'লাল স্কুলবাড়ি'। কবিতা সংগ্রহ, আদম, কৃষ্ণনগর, নদীয়া, ২০১৬। পৃ. ৮৬।
২৩. ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'হলকর্ষণ'। পল্লীপ্রকৃতি, বিশ্বভারতী, ১৯৬২ পৃ. ১০৮।